ত্রিশ বছর পরের কথা। আমি এখনও বেঁচে আছি। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে একটি দিনে আমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হলো না। মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আমি আরও একটি দিন বেশি বাঁচতে চেয়েছিলাম। সেই দিনটি আমাকে নতুন কিছু দেয়নি। সেদিন আমার জীবনে চমকপ্রদ কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু কেন জানি না, সেই দিনটি কাটিয়ে দেওয়ার পর পরদিন ভোরবেলা উঠে আমার মনে হলো আরও একটি দিন বেঁচে থেকে দেখি। এভাবেই চলে গেল অনেকদিন। এক সময় আমি বুঝতে পারলাম বেঁচে থাকা যায়। মাকে হারিয়ে, চাকরি হারিয়ে অথবা প্রেমিকাকে হারিয়েও বেঁচে থাকা যায়। সেই বেঁচে থাকাটা যে শুধু বেঁচে থাকার জন্য তাও নয়। এখন আমি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছি, তবে নিজের ইচ্ছায় নয়। আমার লিভার নষ্ট হয়ে গেছে। আমার বড় দুই ছেলে আমাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবকিছুই করেছে। নানা দেশ ঘুরে এসে এখন আমি নিজ দেশের এক হাসপাতালে শুয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছি। এখন আমার এক হাত ধরে বসে থাকে আমার স্ত্রী আর অন্য হাত আমার ষোড়শী কন্যা। আমার মেয়েকে আমি আদর করে ডাকি পরী। অবিকল পরীর মতোই আমার মেয়েটি। বিশ্বাস হতে চায় না, এটি যে আমারই মেয়ে। মনে হয় হঠাৎ করেই একদিন আকাশ থেকে নেমে এসেছে আমার এই মিষ্টি মেয়েটি।

কয়েক দিন আগে আমার পাশের বেডে নতুন রোগী এসেছে। ছেলেটির বয়স বিশ-একুশ হবে, নাম আকাশ। আকাশ অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো। ছেলেটি সারাদিন বিষণ্ন হয়ে থাকে। আমি হালকা কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করলাম।

: কয়টা খেয়েছিলে?

: ৩২টা।

: মাই গড, ৩২টা স্লিপিং পিল দিব্যি হজম করে ফেললে? আজকাল ঘুমের ওষুধেও দেখছি ভেজাল।

আকাশ কিছু বলল না। এই ছেলেটিকে আমি একবারও হাসতে দেখলাম না। কয়েক দিন ধরে চেষ্টা করার পর আকাশ আমার সঙ্গে কিছুটা সহজ হলো। আকাশ নীলা নামের একটি মেয়েকে ভালোবাসতো। আকাশ আর নীলা মিলে হয় আকাশনীলা। কিন্তু আকাশের নীল রঙ তাকে ছেড়ে একদিন চলে গেল। বর্ণহীন আকাশ তাই অভিমানে সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলো। আকার কাছে সারাদিন একের পর এক লোক আসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আকাশের কাছে কেউ আসে না। আকাশের কেউ নেই। একবার শুধু এক দূরসম্পর্কের মামা এসে কিছুক্ষণ বিরক্তমুখে বসে থেকে চলে গেছে।

দুপুরবেলা লোকজনের ভিড় একটু কমলে আমি আমার পরীকে কাছে ডাকলাম। ফিসফিস করে পরীকে বললাম,

: এই! সকাল থেকে তুই আমার পাশের বেডের ছেলেটির দিকে এমন আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছিস কেন?

: ধ্যাৎ, কি যে বলো না বাবা।

: ছেলেটি দেখতে বেশ। তবে একটু গাধা আছে।

: কেন? গাধা হতে যাবে কেন?

: গাধা না হলে কেউ আত্মহত্যা করতে যায়? তবে ছেলেটির হজমশক্তি চমৎকার। ৩২টি স্লিপিং পিল দিব্যি হজম করে বসে আছে।

: আবার ফাজলামো! দিনকে দিন তুমি যতো বুড়ো হচ্ছো, তোমার রসবোধ বাড়ছে।

: এই পরী, একটা কাজ করতে পারবি?

: কি কাজ বাবা?

: আকাশের হাত ধরে ওর চোখে চোখ রেখে একশবার বলবি... ভালোবাসি ভালোবাসি।

: যাও বাবা, সব সময় ফাজলামি ভাল্লাগে না।

মেয়ে আমার লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। আমার কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলো। আমি আরও শক্ত করে আমার পরীকে জড়িয়ে ধরলাম। পরীকে আমি আর কিছু বললাম না। আমি জানি কি করতে হবে, সেটা আমার পরী খুব ভালো করেই বুঝে গেছে।

বিকেলবেলা পরী গেলো আকাশের কাছে। ছেলেটি এভাবে পরীকে আসতে দেখে নিশ্চয়ই বেশ অবাক হয়েছিলো। পরী বেশ রাগ রাগ সুরে বললো,

: এই যে মশাই, কি ভেবেছেন আপনি? দুনিয়ার সব দুঃখ-কষ্ট আপনি একা নিয়ে বসে থাকবেন। দিন তো আমাকে, আপনার যা যা কষ্ট আছে ঠিক দুই ভাগ করে অর্ধেকটা আমাকে দিন। জলদি দিন, মাপে কমবেশি হলে চলবে না। ঠিক অর্ধেকটুকু আমাকে দিতে হবে।

আকাশ হেসে ফেললো। আমি এবার জানালার বাইরের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেও হাসছে।

: হাসবেন না বলছি, খবরদার! আপনার হাসি খুব বিচ্ছিরি।

আকাশ আবার হাসলো।

: আপনার নাম আকাশ কে রেখেছে বলুন তো। আপনার সঙ্গে তো আকাশের কোনোই মিল নেই। আসুন তো আমার সঙ্গে, বাইরে আসুন, দেখি মিলিয়ে আপনার সঙ্গে আকাশের কোনো মিল খুঁজে পাই কিনা।

আমি আড়চোখে দেখলাম পরী আকাশের হাত ধরেছে।

আমি মরে যাবো যেকোনো দিন। হয়তো আগামীকাল, অথবা আজই। কিন্তু আমার এখন প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ইচ্ছে হয় আরও একটি দিন বেশি বেঁচে থাকতে, আরও একটি ভোরের আলো দেখতে। আমরা আমাদের সারা জীবনে শুধু একের পর এক জিনিস চেয়েই যাই। কখনও চাই মায়ের কাছে, কখনও প্রেমিকার কাছে আবার কখনও বন্ধুর কাছে। সবচেয়ে বেশি চাই সৃষ্টিকর্তার কাছে। সেই চাওয়া কখনও-বা পূর্ণ হয়, বেশির ভাগ সময়ই হয় না। সৌভাগ্যবান মানুষেরা হয়তো অনেক কিছুই পেয়ে যায়। এই সহজ সত্যটা সবাই জানে কিন্তু বুঝতে পারে না সবসময়। সারাটা জীবন চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলাতে মেলাতেই সময় চলে যায় সবার। কিন্তু প্রায় সব মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় হয়তো আসে, যখন সে আর হিসাব মেলাতে পারে না। না পাওয়ার অভিমানে তখন সে সব ফেলে চলে যেতে চায়। কেউ কেউ হয়তো চলেও যায়, আবার কেউবা পায় দ্বিতীয় জীবন। সেই দ্বিতীয় জীবন হয়তো প্রথম জীবনের মতোই হাসি-কান্নায় মেশানো, কিন্তু তখন সে জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যটি ধরে ফেলে - জীবনে নতুন করে পাওয়ার কিছুই নেই, জীবনটাই তো মস্ত এক পাওয়া।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামছে। জানালার পর্দার ফাঁক গলে শেষ বিকেলের এক চিলতে আলো এসে আমাকে আদর করে গেল। পরী এখনও আকাশের হাত ধরে আছে। আমি জানি কাল ভোরের প্রথম আলোটি এসে মিষ্টি পরশ বুলিয়ে আকাশের ঘুম ভাঙাবে।

আনন্দ স্কুল

চতুর্থ

নাসের রহমান

মুনা অনেকের মুখে শুনেছে শহরের ভালো স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটা বেশ ঝামেলার। বাচ্চাদের হলে তো আর কথা নেই। মাকেও আবার নতুন করে লেখাপড়া শুরু করতে হয়। কথাগুলো শুনেছে সে, কিন্তু বাস্তবে বাচ্চা ভর্তি যে আরো অনেক কঠিন তা তখন বুঝতে পারেনি। মীমের জন্মের আগে মনে করতো সন্তান জন্ম দেয়া খুব কঠিন কাজ, পরে সে ধারণা পাল্টে গেল, যখন দেখলো লালন-পালন আরো কঠিন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার চেয়ে আরো শক্ত সন্তানের স্কুল ভর্তি। চার বছরের একটা শিশুকে এভাবে খাতা পেনসিল নিয়ে লিখিত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তা ভাবতেও অবাক লাগে। গত কয়েক মাস থেকে বাচ্চাটিকে বাংলা, ইংরেজি বর্ণমালা লেখার অভ্যাস শুরু করিয়েছে। বাংলা, ইংরেজি সব বর্ণমালা আর সংখ্যাগুলো একনাগাড়ে মুখস্থ বলে যেতে পারে। কিছু বর্ণমালা চিনতে ও লিখতেও পারে। আধো আধো কথা বলার সময় থেকে মুনা তাকে বাংলা ছড়া কবিতা শেখাতে শুরু করেছে। সেসবও অনর্গল বলে যেতে পারে। ইদানীং বারের নাম, মাসের নাম, ফুল ফল পাখির নামও মুখস্থ করিয়েছে। কিন্তু এখন সব ভালো স্কুলে বাচ্চাদের লিখিত পরীক্ষা হবে শুনে তার মাথা স্থির রাখতে পারে না। ভর্তি পরীক্ষার এ্যাডমিট কার্ড আনতে গিয়ে সে হেড মিসট্রেসের সাথে দেখা করে। এতো ছোট বাচ্চাদের কিভাবে লিখিত পরীক্ষা নেবেন? যাদের এখনও বর্ণমালা চেনার বয়স হয়নি তারা প্রশ্ন কিভাবে পড়বে? হেড মিসট্রেস তার কথা শুনে বললেন, দেখুন আমার এখানে নার্সারিতে দুই শিফটে সিট আছে নব্বইটা। ভর্তির জন্য আবেদন পড়েছে এ হাজারের ওপর। বলুন আমি কাকে বাদ দিয়ে কাকে নেব। মুনা মিসট্রেসের মুখের ওপর বললেন, তাই বলে কি শিশুর ওপর এভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করবেন? আপনি যদি একে মানসিক চাপ মনে করেন, তাহলে অন্য স্কুলে ভর্তি করান। অনেক

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

স্কুল আছে যেখানে বাচ্চাদের ভর্তি হতে কোনো পরীক্ষা দিতে হয় না। মুনা আর কথা না বাড়িয়ে এ্যাডমিট নিয়ে বেরিয়ে আসে।

যে করে হোক বাচ্চাকে পরীক্ষার আগে অন্তত বাংলা, ইংরেজি বর্ণমালা লেখা শিখিয়ে ফেলতে হবে। নানা রকম কৌশলে মুনা বাচ্চাকে বর্ণমালার শেখানোর কাজে মগ্ন হয়ে পড়ে। সে স্বরবর্ণের কয়েকটি বর্ণ আগে থেকে লিখতে পারে কিন্তু ঈ ঋ এসব লিখতে কোনো মতে পারে না। মা ঈগল আর উট পাখির গল্প বলে বর্ণমালা লেখায় মনোযোগ আনার চেষ্টা করে। ক্যাসেট থেকে ছড়ার তালে তালে শেখানো বর্ণমালার লেখা সহজে শেখাতে গিয়ে মুনা তাল খুঁজে পায় না। বাচ্চাকে যদি বলে ই লিখতে তখন সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে 'ইঁদুর ভাইয়া ঢোলক বাজায় ইছামতির পাড়ে, ইলিশ মাছ ঘোমটা দিয়ে দেখতে এল তারে'। অনেক চেষ্টা করে হাতে মুখে চুমো দিয়ে মেয়েকে আবার লেখাতে বসায়। ই পর ঈ। অনেকক্ষণ ঈ লেখার চেষ্টা করতে গিয়ে পরে দেখা যায় ই লেখাটা ভুলে গেছে। তারপরও ধৈর্য হারায় না মুনা। আবার নতুন করে লেখাতে শুরু করে। এভাবে একবার সামনে আবার পেছন থেকে সামনে এগোতে থাকে। স্বরবর্ণ শেষে ব্যঞ্জন বর্ণের বিচিত্র লেখনশৈলীর ভেতর ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। খ, ঘ আর ঙ এর মত বাঁক পেছানো বর্ণ নিয়ে বড়ই বিপাকে পড়ে মা- মেয়ে। অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর মেয়ে বলে উঠে, মা গ কি রকম। এক সময় মুনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ছোট মেয়েটিকে এটা- সেটা বলে ভর্ৎসনা করে। শিশুটি কিছু বুঝে আবার কিছু না বুঝে বলে, তুমি মন খারাপ করছ কেন? একটু চুমো দিয়ে দেব তোমাকে? দেখবে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। আবার কখনো বা অসহায় দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুনা তখন নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারে না। দুঃখ আর অভিমানে কান্নায় ভেঙে পড়তে ইচ্ছা করে। এত কম সময়ের মধ্যে বাচ্চাকে এতসব বর্ণমালা লেখা কিভাবে শেখাবে ভেবে কূল পায় না। রাতে খেতে বসে মীমের বাবার সাথে ভর্তি পরীক্ষার কথাটা তুলে। বাবা তখন বলে, দেখ আমি সারাদিন অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকি। ওর লেখাপড়ার ব্যাপারটা তোমাকে সামলাতে হবে। আর এই স্কুলে যে ভর্তি হতে হবে এমন তো কথা নেই। মুনা যুক্তি দেখিয়ে বলে স্কুলটা আমাদের বাসার কাছে। সবাই বলছে এটাতে বাচ্চাদের বেশ কেয়ার নেয়। তাহলে চেষ্টা করে দেখ।

মুনা হাল ছাড়ে না। মন স্থির করে আবার ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

পরীক্ষা শুরু হবে ন'টায়। বাসার কাছে স্কুল, হেঁটেই যাওয়া যায়। তবু মুনা বাসা থেকে বেরিয়ে রিকশা নেয়। একটু আগেভাগে যাওয়া ভালো। সন্তানের প্রথম পরীক্ষা। ভয় পেয়ে যেতে পারে। অন্তত সিটে বসিয়ে পাশে কিছুক্ষণ থাকলে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। স্কুলের কাছে রাস্তার মোড়ে এসে মুনা অবাক হয়ে যায়। আশপাশে গাড়ির লম্বা লাইন। রিকশা কাছে ঘেঁষার কোনো জো নেই। নেমে গিয়ে হাঁটতে শুরু করে। এক হাতে মীমকে ধরা। মীমের বুকের ওপর জামার সাথে পিন দিয়ে এ্যাডমিট কার্ড লাগিয়ে দিয়েছে। মীমের অন্য হাতে ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স। এরকম হাজারো শিশু পরীক্ষার্থী ভর্তির জন্য এগিয়ে চলছে পিতা-মাতার সাথে। স্কুলের গেটের কাছে এসে সে কিছুটা হতবাক হয়ে যায়। এত লোকজন দাঁড়িয়ে আছে কেন? আস্তে আস্তে আরো কাছে গিয়ে থেমে যেতে হলো। আর এগোতে পারছে না। মা-বাবারা এত ভিড় করেছে পরীক্ষার্থীদের স্কুলে ঢোকার কোনো সুযোগ নেই। ভিড় ঠেলে মুনা এক পা এক পা করে সামনের দিকে যায়। অনেকে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোমতে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। আবার অনেকে বাচ্চা ভেতরে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কলাপসিবল গেট একটু ফাঁক করে রশি টানিয়ে রেখেছে। যেন সহজে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে। দারোয়ান দু'জন ভেতরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে ঐ ফাঁকে বাচ্চারাও ঢুকতে পারছে না। আর বাইরের দিকে গার্ডিয়ানদের কেউ কেউ ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের বাচ্চারা কোনোমতে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। মাইকে বলার পরও কেউ যেন গেইট ছেড়ে নিচে নামতে চাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর রশি নিচের দিকে নামিয়ে দারোয়ান বলল, বাচ্চাদের ওপর দিয়ে পার করে দেন। আর কোনো উপায় না দেখে মুনা বাচ্চা উপরের দিকে তুলে ধরে। দারোয়ান হাত বাড়িয়ে অনেকটা টান দিয়ে বাচ্চাকে ভেতরে ঢোকায়। অমনি বাচ্চা কাঁদতে শুরু করে। ওরা দ্রুত বাচ্চাকে মাঠের মাঝে লাইনে দাঁড়ানো অন্য বাচ্চাদের সাথে দাঁড় করিয়ে দেয়। ওখানেও অনেকে চিৎকার করে কাঁদছে। তাদের কান্নার সাথে যোগ হয়েছে মাইকের বিদঘুটে আওয়াজ। তখন মুনা অনেকটা ধাক্কা মেরে কয়েকজন মহিলাকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে মাঠে ছুটে যায়। মীম তখন কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা আমি পরীক্ষা দেব না, বাসায় চলে যাব। বাচ্চাকে কোলে তুলে আদর করতে করতে চোখের জল মুঝে দেয়। আর বলে কিচ্ছু অসুবিধা নেই, এই যে তোমার মত অনেকে পরীক্ষা দিতে এসেছে। ততক্ষণে দারোয়ান এসে মুনাকে তাড়াতাড়ি সরে যেতে বলে। মাইকে কে একজন ভাঙা গলায় বলছে, গার্ডিয়ানরা কেউ ভেতরে ঢুকবেন না, বাচ্চা কাঁদলে তাকে বাসায় নিয়ে চলে যান। মুনা বাচ্চাকে কোল থেকে রেখে অনেকটা দৌড়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়। বাচ্চাও পেছনে পেছনে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে। সে কোলে তুলে আবার আদর করে কান্না থামাতে চেষ্টা করে। পরীক্ষা দিলে চিপস কিনে দেবে, টুইংগাম দেবে, আইসক্রিম দেবে বলে মানাতে চেষ্টা করে। বাচ্চা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে বলে, তোমাকে এখানে থাকতে হবে। তুমি বাইরে যেতে পারবে না। মা বলে, আচ্ছা আমি এখানে বসে থাকব। ততক্ষণে বাচ্চাদের ভেতরে ঢোকাতে শুরু করেছে। যেসব বাচ্চারা কান্না করছে তাদেরকে হলে ঢুকতে দিচ্ছে না। মীমকে হাতে ধরে মাঠ পেরিয়ে স্কুলের বারান্দার কাছে নিয়ে যেতেই মাইকে ঘোষণা আসে কোনো গার্ডিয়ান মাঠের ভেতর থাকবেন না। মুনা আর দেরি না করে একজন আয়াকে অনুরোধ করে বলে, ভাই, তোমাকে বকশিশ দেব, আমার মেয়েটাকে একটু সিটে বসিয়ে দাও। আয়া মীমকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে। মুনা একটু দাঁড়িয়ে দেখে মেয়েটি বসেছে কিনা। তারপর ধীর পায়ে মাঠ পেরিয়ে গেটের পাশে বাদাম গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। ওখানে আরো কয়েকজন গার্ডিয়ান দেয়াল টপকিয়ে ঠুকে পড়েছে। ওদের অনেকের বাচ্চা এখনও হলের ভেতর ঢুকতে পারেনি কান্নার জন্য। একটু পর মাইকে বললো স্কুলের গেটের ভেতর যে সব গার্ডিয়ান ঢুকেছেন তারা অতি সত্বর বের হয়ে যান। নতুবা তাদের বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করানো হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে স্কুলের একজন এসে জানতে চাইলো আপনার বাচ্চার রোল নম্বর কত। এবং সাথে সাথে নম্বরটা কাগজে টুকে নিল। তখনই সন্দেহ হলো হেড মিসট্রেসকে রিপোর্ট করা হবে। মুনা ভাবল, এখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, বাচ্চাতো সিটে বসে গিয়েছে। সে বেরিয়ে পড়ল। গেটের বাইরে এসে দেখল, গার্ডিয়ানদের ভিড় আগের চেয়ে একটু কমেছে। সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছে। তবে এখনও অনেকে কলাপসিবল গেট ছাড়েনি, ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মহিলাদের অনেক সিঁড়িতে বসেও পড়েছে। মুনা নিজেকে হালকা করার জন্য একপাশে গিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। ওরকম কোনো জায়গা খুঁজে পায় না। তবুও হেঁটে হেঁটে এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত গিয়ে রেলিং-এর ওপর বসে পড়ে।

আধঘন্টা যেতে না যেতে গেট থেকে চিৎকার আসে, এ বাচ্চা কার নিয়ে যান। মুনা দাঁড়িয়ে দেখে ছোট্ট বাচ্চাটিকে দারোয়ান দু'হাতে ওপরে তুলে ধরেছে। বাচ্চাটির চোখের জল গড়িয়ে নাকে মুখে একাকার হয়ে গেছে। মা দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল অন্য মায়েদের সাথে। পাশের জন ইশারা করতে দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাকে বুকে টেনে নেয়। বাচ্চা মার কাছে এসে আবার নতুন ভাবে কাঁদতে শুরু করে। খানিক পর আরও বাচ্চা এভাবে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসতে থাকে। কোনো কোনো বাচ্চা পেশাব করে জামা কাপড়ও ভিজিয়ে ফেলেছে। আর দারোয়ান শূন্যে তুলে বাচ্চাদের একের পর এক দেখাচ্ছে। মুনা আস্তে আস্তে গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়। আবার কোনো সময় তার বাচ্চাকেও এভাবে তুলে ধরে ঠিক নেই। কিছুক্ষণ পর পর এক একটি বাচ্চা বেরিয়ে আসছে। তাদের দেখলে মনে হয় তারা এতক্ষণ নিজের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছে। তাদের যেন কান্নার শক্তিও নেই আর। মা-বাবাকে দেখতেই তাদের বুকে ঝাপিয়ে পড়ছে। মুনা ভাবনায় পড়ে গেল। কি জানি তার মেয়েটি ওখানে বসে বসে কি করছে। কিছু লিখতে পারছে কিনা। যা শিখিয়েছে সব লিখে দিয়ে আসতে বলেছে। লিখতে ধরলে কিন্তু সব লিখে ফেলবে। কেউ কেউ বলছে ওখানে বল দেখাচ্ছে বই দেখাচ্ছে আর বাচ্চাদের বলছে তোমরা খাতায় লিখ। এসব তো সে লিখতে পারবে না। বর্ণমালাও নাকি সবগুলো না লিখে মাঝে মাঝে লিখতে বলছে। মুনা কোনো মতেই নিজেকে চিন্তামুক্ত করতে পারছে না। সে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখে আয়াটা মীমকে নিয়ে আসছে। হাত-পা ছুড়ে কান্না করতে করতে এগিয়ে আসছে। মুনা অনেকটা তাড়াহুড়া করে গেটে গিয়ে দাঁড়ায়। মাকে দেখেই মীম চিৎকার করে বলে উঠে, আমি এ স্কুলে পড়বো না। টিচারেরা শুধু বকা দেয়। এসবের কিছুই যেন মুনার কানে পৌঁছে না। বাচ্চাকে বুকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে। সে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারে না। তার দুচোখে জল এসে যায়। স্কুলের লম্বা বারান্দা, খোলা মাঠ, মাঠের চার পাশে বড় বড় গাছ আর শীতের হাওয়ায় ঝরে পড়া শুকনো পাতা সবকিছু যেন ঝাপসা হয়ে ওঠে। মাথাটাও ঘুরতে শুরু করে। হঠাৎ স্কুলের ঘন্টা বেজে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মাঠে নেমে আসে। এদিক সেদিক ছুটাছুটি শুরু করে। তাদের পদচারণায় শুকনো পাতারা মড়মড়িয়ে উঠে। শিশুর কোলাহল আর পাতার শব্দ মীমের কান্না থামিয়ে দেয়। সে মাকে বলে, আমিও ওদের সাথে খেলতে যাব। মুনার চোখের জল ততক্ষণে বাতাসে মিলিয়ে যায়। মনটাও যেন হালকা হতে থাকে। এলোমেলো ভাবনাটা কেটে যায়। সে মেয়ের কথায় সায় দিয়ে তাকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। মীম মুহূর্ত দেরি না করে আনন্দে নাচতে নাচতে শিশুদের মাঝে মিশে যায়। গেটের বাইরে অপেক্ষমাণ গার্ডিয়ানরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এখন সব মা-বাবারাও শিশুদের মুখরিত কলকলানিতে বিভোর হয়ে আছে। তারা যেন ভাবছে আহা শিশুদের স্কুল যদি এভাবে আনন্দময় হয়ে উঠতো!

PHILIPS